বাংলা শব্দভান্ডারের বিবর্তন : সাম্প্রতিক প্রবণতা

দিলীপ নাহা

১

''ঘনরসময়ী গভীরা সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।।"

'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র প্রাচীন বাঙালি কবি 'বঙ্গালবাণী'কে তুলনা করেছেন পুণ্যতোয়া গঙ্গার সঙ্গে। উভয়েই ঘনরসময়ী গভীর ও আনন্দদায়িনী। বহু সহস্র বছর ধরে পুণ্যতোয়া গঙ্গার যেমন গতিপথ পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি 'বঙ্গালবাণী'ও সহস্রাধিক বছর ধরে পরিবর্তনের অনেক স্তর পেরিয়ে এসেছে। নদীর বাঁকের মতোই যুগের নিয়ম মেনে তার সর্বশরীরে পালাবদলের ছাপ। আমরা জানি, মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষা কখনোই স্থির অচল নয়, বহতা নদীর মতোই তা নিয়ত পরিবর্তশীল। ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত।

ভাষার গুরুত্বপূর্ণ দিক তার শব্দভান্ডার। কোন ভাষার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা নির্ধারিত হয় তার ভান্ডারে মজুত শব্দসম্পদের নিরিখে। সজীব ভাষা মাত্রই প্রয়োজন মতো অন্যভাষার শব্দ - উপাদান নিজের ভান্ডারে টেনে নেয়। আর শব্দকোষের আয়তন বাড়িয়ে নেয়। এই গুণে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা শব্দধনে শ্রেষ্ঠ ধনী।

আমরা আমাদের আলোচনা নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখবো। তা হলো বাংলা শব্দভান্ডারের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের ভাষা-পরিস্থিতি।

প্রথমে মনে রাখা ভালো, জাতি হিসেবে বাঙালি সংকর জাতি। বাংলা ভাষাও তাই। অনেক উপাদানের মিশ্রণে এই ভাষার শরীর নির্মিত। মাগধী প্রাকৃতের খোলসা ছেড়ে ৮ম-৯ম শতকের দিকে বাংলাভাষা স্বতন্ত্র এক প্রাদেশিক ভাষা রুপে বেরিয়ে আসে। তখন বাংলা ভান্ডারে শব্দসম্পদ বলতে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত আর্যভাষার তৎসম - তদ্ভব অর্ধতৎসম উপাদানের সঙ্গে দেশি, অনার্যমূল ও আঞ্চলিক শব্দ-উপাদান। চর্যাগানের ভাষায় তৎসম উপাদান লক্ষণীয়ভাবে কম। তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দ-উপাদানই চর্যায় বেশি। আগন্তুক বিদেশী উপাদান নেই।

তুর্কি আক্রমণের পথ ধরে দেশে যে রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে, বাংলাভাষায় তার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। মুসলমান শাসনের পাঁচ-ছয়শ' বছর সময়কালে রাজকার্য, শাসনকর্ম, রাজস্বব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, দৈনন্দিন জীবনযাপন, জীবিকা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে শত শত বৈদেশিক শব্দ - উপাদান– তুর্কি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, পোর্তুগীজ থেকে বাংলা ভাষায় আশ্রয় নেয়। তবে সব শবই যে বাংলায় স্থায়ী হতে পেরেছে তা কিন্তু নয়। শব্দের গ্রহণ বর্জন বা রক্ষণের প্রক্রিয়া জটিল ও রহস্যময়। ভাষা সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিস্থিতি, যুগগত রুচি ও চাহিদা বদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উপযোগিতা নির্ধারিত হয়। নিজস্ব প্রাণধর্ম অনুযায়ী ভাষায় নিজেই নির্বাচনের কাজটি করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথা যথার্থ যে 'ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই করতে থাকে।'

মধ্যযুগে কথ্য ব্যবহারে এই যাবনি উপাদান খুব সহজে হয়ত গৃহীত হয়েছে, তবে বাংলা কাব্যের লেখ্যরীতির খাস-দরবারে তার আসন পাকা হতে সময় লেগেছে। একদিকে সংস্কৃতের ঐতিহ্য, অন্যদিকে লোকসমাজের প্রচলিত মিশ্র উপাদানে মন্ডিত কথ্যভাষা–এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করে সেকালের কবিকুলকে চলতে হয়েছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে ভারতচন্দ্রকে প্রচলিত রীতির বিদ্রোহ করে বলতে হয়েছে: ''অতএব কহি ভাষা যাবনি মিশাল।"

বস্তুত সেকালের নাগরিক মানুষের ভাষারুচিকে মান্যতা দিয়েছেন তিনি– যাদের কথ্য বাংলার আরবি-ফারসির উপাদান যথেষ্টই ছিল। বাংলার শরীরে যাবনি উপাদান এমন ভাবে মিশে গেছে যে আলাদা ভাবে এদের শনাক্ত করাই কঠিন। বাজার, সরকার, দপ্তর, হাজির, বাগান, বাগিচা, হাজার, হাওয়া, লাল এমন শত শত শব্দ উল্লেখ করা যেতে পারে যে শব্দুগলি ছাড়া বাংলাভাষা অচল। যখন বলি 'মসনদ দখলের লড়াই' বা 'সরকারি দপ্তরে লাগাতার জঙ্গিহানা' বা 'ময়দানে তাজ বদলের হাওয়া' তখন একবারও কি মনে হয় আমরা বাংলায় আদৌ কথা বলছি না, বলছি আরবি-ফার্সিতে। বাক্যগুলিতে কয়েকটি বিভক্তি ছাড়া বাংলার দেখা নেই। বিদেশি অতিথি শব্দরা এতটাই বাংলার সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি করেছে বিগত আটশ' বছরে। এগুলির প্রয়োগগত উপযোগিতা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করে বলা যায়, বাজারে 'সহস্র' টাকার নোটের চেয়ে 'হাজার' টাকার নোট ভাঙানো সহজ। 'সমনজারি'র বদলে 'আহ্বান' প্রচার চালু করতে কোন সংস্কৃত পন্ডিতও রাজি হবে না। 'মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে' বললে বক্তার মনের ভাব যতখানি বোঝা যায় 'মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাগ্রস্ত' বললে শ্রোতার মনে খটকা লাগবে। 'নেশাখোর'কে 'মাদকসেবী' বললে খামকা তার নেশা ছুটে যেতে পারে। ছাত্রপ্রহাররত কোন পন্ডিতকে বলতেই পারি, 'আহা বেচারাকে মারবেন না।' কিন্তু যদি বলি, 'নিরুপায় বা নিঃসহায়কে মারবেন না' তাহলে পন্ডিত মশায়ের মনেও করুণরসের বদলে হাস্যরস সঞ্চার হবে। 'বদমায়েস'কে 'দুর্বৃত্ত' বললে তার চোট তেমন বেশি লাগবে না। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় বিদেশি শব্দের পক্ষে বলেন, 'এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েছে।'

কয়েক হাজার 'যাবনি' শব্দের মধ্যে সবই যে সমান আতিথ্য পেয়েছে এমন ভাবার কারণ নেই। আবার গা - জোয়ারি ভাবে অনেক শব্দকে চেষ্টা করেও বাংলার সঙ্গে মেশানো যায় নি। বিশ শতকের প্রথমদিকে মক্তব মাদ্রাসার আরবি - ফার্সি - উর্দু উপাদানে বোঝাই যে বাংলার চর্চা শুরু হয়েছিল বাংলার স্বভাবধর্মের সঙ্গে তার মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নানা নমুনা তুলে বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিষয়ে 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষ' প্রবন্ধে ও কিছু চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ গভীর তাৎপর্যবাহী। রবীন্দ্রনাথ

মনে করেন, জবরদস্তি করে কোন শব্দকে ভাষায় প্রক্ষেপ করা ঠিক নয়। 'হত্যা' অর্থে 'খুন' বাংলায় বেখাপ হয় নি, কিন্তু 'রক্ত' অর্থে 'খুন' বাংলায় চলে নি। চালাবার চেষ্টা বৃথা। এ বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের ঘটনা সবার জানা। 'ভাষামাত্রের একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না।' মনে রাখা দরকার যে সমাজ-পরিস্থতি শব্দের ব্যবহারকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিক করে। এতদিন জেল, জেলবন্দী, কয়েদি শব্দের ব্যবহারে আমাদের কোন সংকোচ ছিল না। এখন মানবাধিকার চেতনার প্রসারে ফলে শব্দগুলি বাতিল।

দুই

আধুনিক যুগের বাংলাভাষা গদ্যের বিকাশের প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়েছে। কিন্তু ভাষারীতি নির্ধারণে, শব্দ-উপাদান ব্যবহারে প্রথমাবধি সবার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় ও মতভেদ ছিল যথেষ্ট। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যলেখক পন্ডিত -মুন্সিদের মধ্যেও বাংলা গদ্যের লেখ্যরূপ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। প্রধান লেখক মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত - পন্থী। উল্টোদিকে মুন্সি অভিধান সঙ্গে রাখতে হয়। পাশাপাশি পেয়ে যাই উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' -এর গ্রাম্য চলিত দেশি উপাদানে ভরা সজীব বাংলাভাষা। ভাষার মধ্যে কতটুকু থাকবে সংস্কৃতের উপাদান, কতটুকু থাকবে দেশি-বিদেশি উপাদান– উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এ নিয়ে দেশীয় লেখক-পন্ডিতেরা গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করেন। বাংলা ভাষার আদর্শ রূপ নির্ধারণে এঁদের মতভেদ, লেখনীযুদ্ধ এবং রচিত প্রবন্ধাদির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাচিন্তাবিদের মননিষ্ঠ বিশ্লেষণ বাংলা ভাষার অর্ন্তগত যথার্থ রূপ আবিষ্কারে ও তার উপাদানগত বৈশিষ্ট্য বিচারে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

ভাষারীতি ও শব্দ-উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেকালে স্পষ্টত দুই ভাগ। একদিকে সংস্কৃতপন্থী, অন্যদিকে সংস্কারপন্থী। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদী' রক্ষণশীল পন্ডিতবর্গ বাংলা ভাষাকে শ্রীহীন, নীরস দুর্লভ করে তুলেছেন। অন্যদিকে উদারতার নামে নব্যপন্থীরা বাংলা ভাষার ওপর 'দৌরাত্ম্য' করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে মধ্যপন্থী। তৎসম শব্দ 'ভ্রাতা', 'কল্য', 'কর্ণ', 'মস্তক', 'স্বর্ণ', 'অশ্ব', বর্জন করে 'ভাই, 'কাল', 'কান', 'মাথা', 'সোনা', 'ঘোড়া', ইত্যাদি তদ্ভব চলিত রূপ ব্যবহারের পক্ষে সেকালে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় জোর সওয়াল করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে, 'ঘর' আছে বলে 'গৃহ'কে বা 'মাথা' আছে বলে 'মস্তক'কে উচ্ছেদ কার অনুচিত। 'ঘর' 'মাথা' থাকবে, 'গৃহ', 'মস্তক' ও থাকবে। 'ভাই' থাকবে 'ভ্রাতা'ও থাকবে। 'হে ভ্রাতঃ ডাকের চেয়ে 'ভাই রে' অনেক বেশি মধুর। তাই বলে 'ভাইভাব' চলেনা, 'ভ্রাতৃভাব'ই লিখতে হবে। মোটকথা, গায়ের জোরে কোন শব্দকে উচ্ছেদ করে ভাষার শব্দভান্ডারকে ধনশূন্য করতে রাজি নন তিনি– 'ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্করূণ উপযোগিতার বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অশ্লীল' ভিন্ন যে কোন শব্দ রচনায় গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। –'ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার যত শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করি, 'প্রয়োজনে সংস্কৃতের শব্দসম্পদ ব্যবহার করাই যেতে পারে।

সেকালের চলিত গদ্যের মধ্যে তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, কক্‌নি, কথ্য শব্দ যথেষ্ট জায়গা করে নেয়। হুতোমী ভাষার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অভিযোগ– এর তত শব্দধন নেই, এর কথ্যবুলি পবিত্রতাশূন্য। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছেন এই বলে যে, ইংরেজি, সংস্কৃত, তদ্ভব কথ্য, দেশি, বিদেশি ইত্যাদির নানা উপাদানের আবর্তের মাঝে 'বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতী ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি।' একদিকে সংস্কৃতের প্রবল স্রোত, অন্যদিকে ইংরেজির বেনোজাল– এই দুয়ে মধ্যে পড়ে বাংলার স্রোত বড় ক্ষীণ বইছে। 'ত্রিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত।' বঙ্গিমচন্দ্র মনে করেন, প্রাচীন ও নব্য উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ছেড়ে বাংলা ভাষাকে নিজস্ব স্বভাবধর্ম অনুযায়ী উপাদান বেছে নিতে হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরীও চলিত শব্দসম্ভারকে লেখার ভাষায় স্থান দেবার পক্ষপাতী। তাঁরা বার বার চলিত ভাষার শব্দ - উপাদান ব্যবহার করে ভাষায় গতি আনার পক্ষে ওকালতি করেছেন।

তিন

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কেমন ছিল বাংলা শব্দভান্ডার? টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম প্যাঁচার লেখা গদ্যগ্রন্থে তার বিশ্বস্ত নমুনা পাই। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের ভাষার এক নমুনা রাজনারায়ণ বসু ব্যঙ্গচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। নমুনাটি এই– ''আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। physic বেশ operate করেছিল four times হলো, অদ্য কিছু better বোধ করেছেন।''

সেই ট্রাডিশান আজও অব্যাহত। একালের আত্মসচেতন বাঙালিও ইংরেজি শব্দের সাহায্য ছাড়া এক-পা এগোতে (বলা উচিত এক বাক্য এগোতে) পারেন না। শাসক ইংরেজ চলে গেছেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষার উপনিবেশে আমাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ কায়েম করে গেছেন।

ইংরেজি উপাদানে বিভূতি বাংলাভাষা দেড়শ বছর পরেও একালের এক বাঙালি চিকিৎসকের মুখে কী শোভা বর্ধন করছে তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। এক বাঙালি ডাক্তার তাঁর বাঙালি রোগীর পরিবারকে পরামর্শ দেন ঃ ''এটা sexually transmitted disease, immediate operation না করালে flare up করতে পারে, নানা complicatouns দেখা দিতে পারে। আপনার স্ত্রীর uters already affected। যে কোন ভালো nursing home এ pperation করিয়ে নিতে পারেন। side effect নেই, infection বা bleeding এর chance নেই। just a few hours এর মামলা। খরচও within your budget. Nursing home-এ contact করুন। Package system -এ যাওয়াই better। সবরকমের test, x-ray, culture, medicine, cabine charge, doctors feea ধরে total cost just forty to fifty housand।''

বাঙালি রোগীর কাছে এই বাংলাভাষা জলবৎ তরল, বুঝতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সত্যই যদি ডাক্তারবাবু 'শুদ্ধ' বাংলায় পরামর্শটি

দিতেন তবে রোগীকে কিছুটা সমস্যায় পড়তেই হত।

ইংরেজ রাজত্বের পরে বাংলায় ইংরেজির উপাদান বেড়েছে অনেকগুন।। রাজনারায়ণের কালে সাধারণ বাঙালি কান ইংরেজিতে হয়ত তত অভ্যস্ত হয়নি, এখন পুরোপুরি অভ্যস্ত। এই যা পার্থক্য। আগে এই জাতীয় 'বাংরেজি' (কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়) গান, ছড়া, নাটক ছিল রঙ্গকৌতুকের বিষয়। এখন আর কৌতুকের বিষয় নয়, আশঙ্কার বিষয়।

বাংলা ভাষার উপাদান নিয়ে একালের সমস্যার চেহারা কিছুটা ভিন্ন। একালের এক অতি পরিচিত শব্দ– বিশ্বায়ন। আমাদের উৎপাদনে কৃষিতে শিল্পে অর্থনীতিতে সাহিত্যের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রভাব আমরা প্রতিদিন অনুভব করি। তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদ মাধ্যমের অকল্পনীয় উন্নতি ও প্রসার সমগ্র বিশ্বকে এক মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। মানুষের দ্রুতগামী চিন্তা সমান দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আমাদের জীবনের ধারাকে দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বৈপ্লবিক আবিষ্কার। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে। বাণিজ্যিকরণের পথে শুধু ক্রিকেট দুনিয়াই চলছে তা নয়, আমাদের শিল্প-সংগীতের অলঙ্ঘনীয় ললাটলিখনও তাই। সংবাদ ও বিনোদনের বৈদ্যুতিন মাধ্যম তথা 'চ্যানেল' স্থির করে দেওয়া ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় কোন 'মডেল'কে নিতে হবে ক্ষমতাবান সংবাদ-প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশনা সংস্থা নির্ধারণ করে দেয় কোন ভাষায় লিখতে হবে। কোন্ শব্দ কোন্ বানানে লিখতে হবে সংস্কৃতির আনাচে কানাচে চলার পথনির্দেশও আমরা পেয়ে যাই সেখানে। তারা জানেন, কেমন করে লিখতে পাবলিক ঠিক ঠিক 'খাবে'।

দু'একটি নমুনা দেখা যাক্। রাজনৈতিক সংবাদদাতার কলমে জানতে পারি, 'নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাকফুটে', 'দল এখন বিরোধী নেতার বাউন্সার সামলাতে ব্যস্ত', 'নির্বাচন কমিশনের বাউন্সার কী ভাবে সামলানো হবে, তা নিয়ে এখন যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার', 'আই. সি. সি. প্রেসিডেন্ট তাঁর দিকে যে-হাফভলিটা দিয়েছিলেন, সেটাকে মাঠের বাইরে না পাঠিয়ে বেশ নরম একটা ডেফেন্সিভ স্ট্রোক খেললেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান দলের অধিনায়ক।'

বিনোদনের চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামারের জগতের অন্য এক ভাষা আছে। আকাশবাণীর প্রচারিত বাংলার সংবাদের শিষ্ট ধ্রুপদী রীতির ভাষার সঙ্গে বর্তমান এফ. এম. চ্যানেলের হিন্দি-ইংরেজির মিলিজুলি জগাখিচুড়ি বাংলার তুলনা করলে পার্থক্য স্পষ্ট হবে। শুধুই ইংরেজি নয়, সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলিউডি হিন্দি বুলি। সাধারণ শ্রোতাদের মতে এই বাংলাভাষা অত্যন্ত 'স্মার্ট' ও 'লাইভলি'। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই 'স্মার্ট' ভাষার কদর বেড়েই চলেছে।

এক চাকচিক্যময় অনুষ্ঠানে শিশু সঙ্গীতশিল্পীর কৃতিত্বকে বিচারক প্রশংসা করে বলেন, 'সিক্সার! বল মাঠের বাইরে– খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

সংবাদ চ্যানেলের সংবাদ পাঠিকার মুখে শুনি, 'সুচিত্রা সেন অনেক দিন আগে ফিল্ম জগৎকে গুড-বাই করে চলে গেছেন...' অথবা, 'শাহরুখ খান তাঁর বিন্দাস ইমেজ কি পারবেন ধরে রাখতে?' সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'আমরা জানতে চাইব আপনাদের এ সম্পর্কের পেছনে কি কেমিস্ট্রি রয়েছে?'। একালের অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হচ্ছে 'ধুম-মাচালো ভক্তিগীতি', 'দুনিয়া ডট কম্'। অনেকদিন আগে থেকে সব অনুষ্ঠানের 'কাউন্ট ডাউন' চলে। তারপর হয় অনুষ্ঠানের 'কিক্ অফ'। 'পূজা ধামাকা', 'হাঙ্গামা' বা 'বড়দিনের ধামাকা' তো আছেই। অর্থাৎ একালের হিন্দি - ইংরেজির এই সংকর ভাষার মোচ্ছবে গতিময় হতে তেজ বা স্মার্টনেস্ই শেষ কথা। ভাষার শুদ্ধাচার শিষ্টতা মান্যতা ক্রমেই বোধ হয় পেছনের সারিতে চলে আসছে। বড় হয়ে উঠছে আকর্ষণীয় ভাবে তথ্যজ্ঞাপন। অথবা বলা যায়, এ ভাবেই নতুন নতুন শব্দ-উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলার নতুন ভাষাবিশ্ব। ভারততীর্থের আদর্শে বুঝি এখানে সবই 'এক দেহে হবে লীন'।

ভাষা যেহেতু প্রবল ভাবেই এক সামাজিক ব্যাপারে, ফলে পরিবর্তনশীল ও গতিময় এই নতুন দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে ভাষাও নিজেকে নবীন করে তুলছে। গ্রহণ-বর্জন ও ভাঙা - গড়ার মধ্য দিয়ে শব্দের সাম্রাজ্য প্রতিদিনই যাচ্ছে পাল্টে। বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যে ইংরেজি আধিপত্য নিয়ে আজ আর প্রশ্নের অবকাশ নেই। আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার বেড়া ডিঙিয়ে অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ে, সংযোগ স্থাপনে ও তথ্য জ্ঞাপনে ইংরেজি এযুগে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য এক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা–যথার্থ বিশ্বজনীন মাধ্যম।

নতুনের হাওয়া আমাদের অভ্যস্ত শব্দজগতেরচেহারা দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই-মেল, অন-লাইনকে ঘিরে অসংখ্য পরিভাষার রাজত্ব। বাংলা পরিভাষা অচল প্রায়। অনেক সুখশ্রাব্য বাংলা শব্দকে হাটিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে নিত্য নতুন ইংরেজি শব্দ। এসে গেছে 'রেডিও জকি' নামক এক অভিনব 'হরবোলা' গোষ্ঠী। এখন ছাত্রদের সামনে আর 'আদর্শ' দাঁড় করানো হয় না। এখন দেশ জুড়ে 'আইকন', 'আইডল', 'রোল মডেল'দের ভীড়। কোন অনুষ্ঠানের জন্য আর 'সঞ্চালক' দরকার নেই। এখন 'অ্যাংকার'দের যুগ। চারদিকে শুধুই স্টারঃ 'বিগস্টার', 'সুপারস্টার', 'মেগাস্টার'। আসছে 'বিগ বাজেট', 'মেগা বাজেটে'র 'সুপার ডুপার' ছবি।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা বোধ হয় আরো বেশি। সুন্দর, চমৎকার, অপূর্ব, দারুণ এই শব্দগুলিতে বোধ হয় আর তত জোর নেই। মুদ্রার মতোই শব্দের চাকচিক্য হ্রাস পায়। তার ব্যবহারযোগ্যতা কমে আসে, শক্তি ক্ষয় হয়। একালের নতুন প্রজন্ম বেছে নিয়েছে 'ফাটাফাটি', 'ব্যাপক', 'ফান্টা', 'হেভি'। মেয়েটা কেমন দেখতে? –'হেভি'। ডিনার কেমন হলো?–'হেভি'। 'হেভি' শব্দটির এহেন অর্থ-কৌলীন্যের সংবাদ কি সাহেবরা জানেন? অঞ্চলবিশেষে অনুরূপ অর্থে অন্য একটি শব্দ শোনা যায় –'বাম্পার'।

বাংলা বাগ্ধারা ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবল। পুরনো ও প্রচলিত ধাঁচকে ভাঙার প্রবল ঝোঁক এ কালের ভাষায়, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মুখে। সবক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজির প্রভাব অনুভব করা যায়। একালের পন্ডিতেরা 'সেমিনার দেন', সভায় আমরা কোন কিছু 'রীড আউট' করি, কোন কিছুকে 'ইস্যু করি' 'ইস্যুকে টেবিল করি', 'ইস্যুভিত্তিক' আলোচনা করি। অন্যের সঙ্গে 'ডায়ালগ ওপেন' করি, অনেক বক্তব্যের 'কাউন্টার করি'। আগে কোন বক্তব্য বিষয়ে 'আপত্তি করা' হত, এখন 'আপত্তি তোলা' হয়। কাজের মাঝে 'ব্রেক নিই'। কোন কাজে 'এফোর্ট দেবার' জন্য সবার কাছে 'অ্যাপীল রাখি'। দরকার মত 'টিপ্স দিই' বা 'অফেন্স নিই'। সেকালে জনগণ

'গ্রহণ করত', একালে 'পাবলিক খায়'। সাংবাদিকরা বাইট নেয় এখন বাস-ট্রাম ট্রাফিক সিগন্যালে 'দাঁড়ায়' না, সিগ্‌ন্যাল 'খায়'। নিয়ম লঙ্ঘন করলে ড্রাইভার পুলিশের 'কেস খায়'। আগে কোন বিষয়কে 'লঘু করা' হত, এখন 'লাইট করা' হয়।

শুনতে পাই, একালের নতুন প্রজন্ম 'ভাট বকে', 'পেঁয়াজি মারে', 'রংবাজি করে', 'রং দেখায়', বাড়িতে 'খ্যাঁটন' বন্ধ হলে বন্ধুকে 'মুরগি করে', পকেটে 'পাত্তি' না থাকলে কোন 'মাস্তু ছেলে'কে পাকড়াও করে, শত্রুর 'থোবড়'-এর 'জিওগ্রাফি পাল্টে দেয়।' 'লাগু', 'হরগিজ', 'মস্তি', 'বক্‌ওয়াস', 'বিন্দাস', 'খুল্লামখুল্লা'—এই ধরনের শত শত নতুন শব্দ একালের নাগরিক জীবনের কথ্যভাষাকে কি ভাবে পাল্টে দিচ্ছে এবং চলিত গদ্যরীতিতে জায়গা নিচ্ছে, তা একটু লক্ষ করলেই উপলব্ধি হবে। হিন্দি-বচনের প্রতি একালের নূতন প্রজন্মের টান যথেষ্ট বেশি। 'তুমি এখন এসোনা, কেন কি ওই দিন আমি থাকবো না' —এই ধরনের বিচিত্র বাক্যরীতি হিন্দি থেকে সরাসরি নেওয়া। এতকাল বলা হতো ঃ 'কেন না', এখন বলা হচ্ছে' কেন কি'। স্পষ্টতই হিন্দির 'কিঁউ কী'-র প্রভাব।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বঙ্গভাষার ভূতের নাচ' নামক রসরচনায় নির্বিচারে ইংরেজির নকলে বাংলা বাগ্‌ধারা রচনার কয়েকটি সুন্দর নমুনা উপহার দিয়েছেন। সেগুলি আমরা উল্লেখ করতে চাই। একালে কেউ 'নির্বাচন কমিশনকে আবেদন জানান', কেউ 'সরকারকে সহযোগিতা করেন।' প্রচলিত নিয়মে বলা উচিত ছিল, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান', বা 'সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।' তাঁর মন্তব্য যথার্থ যে, 'এই যে বাংলা, লিখতে দেখি ও বলতে শুনি।' আগে বক্তব্য 'পেশ করা' হত, এখন বক্তব্য 'রাখা' হয়। এই ধরনের প্রয়োগ পরিমল গোস্বামীকে কতখানি ক্ষুব্ধ করেছিল তার সরস বর্ণনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ। —''এই ধরনের বাংলা দেখে স্বর্গত পরিমল গোস্বামী মশাই প্রথম প্রথম বিস্ময় বোধ করতেন। পরে এটা তাঁর কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আরও পরে যখন বুঝতে পারেন যে, আমাদের স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার সঙ্গে তাবৎ সম্পর্ক ঘুচিয়ে এবম্প্রকার বাংলাই আসরের দখল নিতে চলেছে, তখন তিনি নিরতিশয় ক্রুব্ধ হন। ক্রুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, চর্তুদিকে এই যে বক্তব্য ও দাবি রাখা হচ্ছে, এর উপরে 'আমি আমার অভিশাপ রাখলুম।''

এবার অন্য এক প্রবণতার কথায় আসি। তা হলো, খেলার ভাষায় কথা বলার মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা। বিশেষত, ক্রিকেটের ভাষা। আমাদের শব্দভান্ডারে একালের ক্রিকেটবিশ্ব আশ্চর্যভাবে ঢুকে পড়েছে। আধুনিক কালে ক্রিকেট নিয়ে আমাদের উন্মাদনার শেষ নেই। নাটকীয়তা ও উট্টেজনায় ভরা এই খেলার অসংখ্য ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ রূপকাশ্রয়ী ব্যঞ্জনা নিয়ে বাংলাভাষায় বাগ্‌ধারা-প্রবচনের নতুন এক ভান্ডার তৈরি করে চলেছে। সাদৃশ্য কল্পনার পথ ধরে অলঙ্কার রচনার এক স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের রয়েছে। সাদৃশ্যের প্রভাবের কারণে প্রাচীন কাল থেকে মল্লযুদ্ধ, তাস, জুয়া এবং বহু গ্রামীণ খেলা থেকে বাংলায় অসংখ্য বাগ্‌ধারা-প্রবচন আমার তৈরি করেছি। তাই আমরা কথা 'বাজিমাৎ করি' একে অন্যকে 'টেক্কা দিই', অফিসে 'বুড়ি ছোঁওয়া' করে চলে আসি বা বসে বসে 'রাজা-উজীর মারি'। কিন্তু ক্রিকেট যে ভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন বাগ্‌ধারা - প্রবচনে বাংলাভাষাকে ভরিয়ে তুলছে তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হতে পারে। ক্রিকেটের মাঠের নানা অভিজ্ঞতার ভাষা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে আমরা প্রকাশ করি। ভীড় বাসে-ট্রেনে কোন সিট খালি হলে সহযাত্রীরা বলেন, ''যাক্ একটা 'উইকেট' পড়লো।'' আগের অবস্থানে ফেরা আমাদের কাছে 'ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন'। বাইরে বেরিয়ে উঠতি বয়সের মেয়েরা 'ফিল্ডিং মারে'। চেষ্টা করে বিগ ক্যাচ্ ধরার। প্রেমের ময়দানে সফল ছেলেকে আমার সাধুবাদ জানাই ক্রিকেটের ভাষাতেই— 'ভালোই ব্যাটিং করছিস্!'

সাংবাদিকদের ছোঁড়া 'প্রশ্নের বাউন্সার' বা 'গুগলি' বা 'দুসরা' কোন্ ব্যাক্তি কী ভাবে সামলান এটা আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। সাংবাদিকের সামনে যাবার আগে কোন ব্যক্তিকে 'পিচ বুঝে' নিজের 'ডিফেন্স' ঠিক করে নিতে হয়। দক্ষ ব্যাটসম্যানের মতো তাঁক কখনো 'স্ট্রেট ড্রাইভ', কখনো 'হুক', কখনো 'পুল' করতে হয়। অনেক বুদ্ধিমান চুপ করে থাকেন। অর্থাৎ প্রশ্নটিকে 'ডাক' করেন। কখনো বল 'আস্তে খেলেন'। অনেক ব্যক্তি আক্রমণাত্মক ভাবে 'চার' বা 'ছক্কা' হাঁকেন। বল 'মাঠের বাইরে পাঠান'। কেউ নাস্তানাবুদ হলে যে রূপকাশ্রিত বিশেষণ-বাগ্‌ধারাগুলি ব্যবহৃত হতে দেখি সেগুলি হলো— 'ক্লীন বোল্ড', 'আউট', 'কট অ্যান্ড বোল্ড'। পত্রিকায় শিরোনাম— 'সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে বোর্ডকর্তা ক্লীন বোল্ড'। অবশ্য, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সরাসরি পরাজয় বর্ণনায় এই শব্দগুচ্ছের ছড়াছড়ি। ইংরেজিতেও ইডিয়মগুলি বহু ব্যবহৃত। কেউ বলেন, 'আমি সোজা ব্যাটে খেলতে ভালোবাসি', এই কথার অর্থ 'আমি সোজা-সাপটা কথা বলতে ভালোবাসি' বা 'সরকারি কাজ করতে ভালোবাসি'।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জীবনের 'নতুন ইনিংস' শুরু করেছেন। পরের পর্যায় বোঝাতে এই শব্দটির তুলনা নেই। শব্দগুলিতে এমন সবার অধিকার। কারো মুড খুব ভালো থাকলে বলি, ও এখন 'ফুল ফর্মে' রয়েছে। বিপরীত অর্থে বলি 'অফ ফর্মে'। সংকটাপন্নকে সান্ত্বনা দিয়ে জ্যোতিষীর মতো করে বলি, 'ব্যাড প্যাঁচ' কেটে যাবে, ধৈর্য ধরো।'

একালের ভাষায় শব্দমুন্ডের ছড়াছড়ি লক্ষ করার মত। 'বাস', 'মাইক', 'মেমো', 'বাইক', 'ফোন' ইত্যাদিতে এতদিনে আমাদের কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ব্যবহারও যথেষ্ট। লেখ্যরীতিতে এরা আর অচ্ছুৎও নয়। কিন্ত 'অ্যাপো' (appointment), 'প্রেসি' (presidency), 'অ্যাড' (avertisement), 'সোফি' (sophisticated) 'ফ্যান্টা' (fantastic), 'প্রিলি' (preliminary), 'ডেমো' (demonstration), 'কো-এড' (co-education), 'ফিলো' (philosophy), 'স্ট্যাট' (statistics), 'ম্যাথ' (math), 'বট' (botany) ইত্যাদির বহুল ব্যবহার অনেকটাই দৌরাত্ম্যের মত মনে হয়। শুধু মুখের ব্যবহারে এরা আটকে নেই। লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে এসে গেছে। বিশেষত, নতুন প্রজন্মের হাতে।

অনুরূপভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি ইংরেজি মুন্ডমাল শব্দের কথা। ব্যস্ততার যুগে সংক্ষেপীকরণের প্রবণতায় শত শত মুন্ডমাল শব্দ আমাদের আমাদের ভাষায় স্তুপীকৃত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে শ্মশানের দৃশ্য আমাদের মনে আছে নিশ্চয়। অসংখ্য মুন্ডু নিয়ে প্রেতের গেন্ডুয়া খেলার বিবরণ। শব্দের মুন্ডমালা নিয়ে একালে আমরাও নতুন খেলায় মেতেছি। শব্দের মুন্ডমালায় সজ্জিত বাংলা ভাষা ক্রমেই কাপালিকের চেহারা নিচ্ছে।

এই শব্দ-সংস্কৃতি ইংরেজির দান। ইংরেজির ধরনে বাংলায় কোন কোন লেখক 'প্র. না. বি,), 'অ. কু. ব' হয়েছিলেন। তবে বাংলায় এই ধারা অচল। অথচ আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ইংরেজি শব্দ থেকে নিষ্কাষিত হাজারো মুন্ডমান শব্দের ভীড়। আমরা PM, MP, MLA, DM BDO, SP, SC. ST. OBC. BPL, PCO, STD, SMS, NGO, AIDS, HIV, VC, CU, BHU, ACR, SCR, SSC, IC, GS, OC, UPS, CUP, JNU, UPএবং আরও কত কি শব্দ বাংলা বানানে নিত্য ব্যবহার করছি। মাস্টার মশাইদের অবস্থা আরো করুণ। তাঁরা কেউ SR কেউ DD কেউ RB প্রভৃতি। 'রক্তকরবী' নাটকের শ্রমিকদের অবস্থা এর থেকে ভালো, তাঁরা বাংলা সংখ্যা পেয়েছিলেন!

ইংরেজির নির্বিচার অনুকরণ যে ভাবে বাংলার নিজস্ব বাক্যরীতিতে বিধ্বস্ত করে চলেছে তা সবার কাছেই আশঙ্কার কারণ। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা ইতিপূর্বে এই জাতীয় কিছু নমুনা আলোচনা করেছি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ থেকে একালের অনেক ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন ও সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে সাধ্যমত সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন। কেউই ইংরেজির বিপক্ষে নন। কিন্তু নির্বিচারে ইংরেজি অন্ধ অনুসরণে বাংলা বাক্য রচনাকে সমর্থন করেন না কেউ।

রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একালেও আমাদের পথনির্দেশের কাজ করতে পারে। বহু দৃষ্টান্ত তুলে ইংরেজি ও বাংলার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, এই দুই ভাষার স্বভাবে অনেক প্রভেদ। 'ইংরেজির সঙ্গে বাংলার এই সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি অনেক সময় অসতর্ক হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই।" বাক্যরীতির বিজাতীয় মিশ্রণকে তিনি রসিকতা করে বলেছেন, ''এগুলো যেমন ভাষার অসবর্ণবিবাহ, ইংরাজিতে চলে বাংলায় চলেনা।" ইংরাজির প্রভাববিকৃতির ফলে 'এবং', 'ও' শব্দ দুটোর অর্থ বাংলা অনেকে 'either,'or' -এর অর্থে লেখেন 'হয়, অথবা' –যা বাংলায় স্বাভাবিক ও প্রচলিত বাক্যরীতি নয়। বাংলায় লেখার কথা– 'হয়, নয়'। ''হয় তোমরা আসবে, নয় আমরা যাবো''। কিন্তু, একালে শোনা যাচ্ছে 'হয় তোমরা আসবে অথবা আমরা যাবো।"

রবীন্দ্রনাথের সাবধান - বাণী স্মরণীয় যে, ভাখার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। তার প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নব্যযুগের আধুনিকতাকে অনিবার্য জেনে বলেছিলেন, ''এখন আর খাঁটি বাঙ্গালি কবি জন্মে না– জন্মিবার যো নাই– জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।" বাংলা ভাষা সম্পর্কেও বোধ হয় একই কথা বলা যায়, তথাকথিত 'খাঁটি' বাংলাভাষাকে ফিরে পাবার কল্পনা নিছক এক হঠকারী কল্পনা মাত্র। পরিবর্তনকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে আধুনিক বাংলাভাষার যথার্থ রূপ-পরিকল্পনা করতে হবে। বাংলা ভাষা যাতে 'ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে' পরিণত না হয় বা 'পরাধীনতা প্রাপ্ত' না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। একালেও অনেকের মত হল– ভাষা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে, কিন্তু অন্যের বশীভূত হবেনা।

প্রমথ চৌধুরী 'আমাদের ভাষা সংকট' নামক প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিদেশি উপাদান গ্রহণ বিষয়ে বলেন, জ্ঞানের চর্চায় ইংরেজি শব্দ-উপাদানকে বাংলা থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করার কোন উপায় নেই। এগুলি বাংলা ভাষার 'অন্তরঙ্গ' উপাদান হয়ে গেছে। বর্ণসংকর বাংলা ভাষার উপাদান মিশ্রণ দেখে যাঁরা খুব ব্যথিত ও কাতর, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরীর চাঁচাছোলা বক্তব্য, ''আমরা এখন যদি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় ফিরে যেতে চাই তা হলে আমাদের ফিরতে হবে আদি-দ্রাবিড়+আদি-মঙ্গল ভাষা; কিন্তু সে ভাষাও হবে সংকর।" অবশ্য তিনি খানিকটা রক্ষণশীল লেখ্যরীতি ক্ষেত্রে। –''বাঙালির মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশি শব্দ বয়কট করতে।"

রাজশেখর বসু একাধিক প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বহিরাগত উপাদান ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলেছেন। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য অতি সমৃদ্ধ ভাষা ইংরেজি থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনই অনিষ্ট হবে না। –''কিন্তু যা আমাদের আছে তাকে অবহেলা করে যদি বিদেশি শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে।" তিনিও অন্য অনেকের মতো মনে করেন। ইংরেজি অনুসরণে বাংলা বাক্য লিখলে 'বাংলা শ্রীঘ্রই একটা উৎকট ভাষায় পরিণত হবে।"

সবশেষে বলা যায়, আজকের বিশ্বায়নের যুগে সারা জগৎ যখন আমার আপনার সঙ্গে কোলাকুলি করার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন ইংরেজি বা অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার দিক থেকে আমাদের মুখ ফেরানোর উপায় নেই। রাষ্ট্রভাষা হিন্দিকেও আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহার থেকে হাটানোর চেষ্টা পন্ডশ্রম মাত্র, প্রয়োজন, অন্য ভাষার উন্নত শব্দসম্পদকে বাংলার নিজস্ব প্রাণধর্মে সঙ্গে সংগতি রেখে যথোপযোগী ব্যবহার। সঠিক ব্যবহার কৌশলে 'বিজাতীয়' উপাদানগুলি বাংলার নিজস্ব 'জাতীয়' সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। আর এর জন্য চাই বাংলা ব্যবহারকারী সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে সচেতনতা।

বাংলা বানান ও পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত দিক্‌নির্দেশ (অনেক বিতর্ক, মতভেদ এবং অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও) একালে নিঃসংশয়ে আমাদের ভাবাচ্ছে ও পথ দেখাচ্ছে। কথায় ও লেখায় শব্দ আর বাক্য ব্যবহারের শৃঙ্খলা-বিধি নিয়ে অনেক মননশীল লেখক ও ভাষাচিন্তাবিদ্ অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। এইভাবেই তৈরি হচ্ছে সামাজিক সচেতনতা। সচেতনতার প্রসারই আমাদের বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর একমাত্র রক্ষাকবচ। নইলে ভাষার নৈরাজ্য' জাতীয় জীবনেও আমাদের একদিন 'নেই রাজ্য' -এর দিকে ঠেনে দেবে। ভুলে গেলে চলবে না, স্বামী বিবেকানন্দের কথা, 'ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়–লক্ষণ'।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার
২। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ।
৩। প্রবন্ধাবলী: রাজশেখর বসু, মিত্রা ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড
৪। প্রবন্ধ সংগ্রহ: প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী।
৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন।
৬। কাজের বাংলা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী
৭। ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ: মনসুর মুসা, মুক্তধারা, বাংলাদেশ
৮। ভাষা মনন : বাঙালি মনীষা', পবিত্র সরকার, পুনশ্চ।
৯। রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা:' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণা প্রকাশনী।
১০। অপর ভাষা: দেবেশ রায়, অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, আগরতলা।